মেগা বাজেট মেগা সংশয়: শিক্ষা খাতে বরাদ্দের প্রকৃত চিত্র

ইসতিয়াক রায়হান

গত ১ জুন ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশের ৪৬তম বাজেট পেশ হয় জাতীয় সংসদে এবং ২৯ জুন ২০১৭ তারিখে তা পাস হয়। বাজেট উত্থাপনের পর থেকে মাস জুড়ে চলে একে নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা। মূলত অধিকাংশ আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল নতুন ভ্যাট আইন ও ব্যাংক আমানতের ওপর আবগারি শুল্ক বৃদ্ধির বিষয়টি এবং সেই সাথে বাজেটের আকৃতি। অবশেষে নতুন ভ্যাট আইন দুই বছরের জন্য স্থগিত এবং ব্যাংক আমানতের ওপর আবগারি শুল্ক বৃদ্ধির বদলে হ্রাসের মাধ্যমে পাস হয় ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট। এই প্রবন্ধে বাজেট-এর মূল দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনার পাশাপাশি বিশেষভাবে শিক্ষা খাত নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

আকৃতিগত কারণে এ বছরের বাজেটকে বলা হচ্ছে মেগা বাজেট। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই মেগা বাজেটের অবয়ব পর্যবেক্ষণ করলে হাজির হয় এক মেগা সংশয়, কারণ বিগত বছরগুলোর মতো এ বাজেটেও সর্বজনের কাছ থেকে সংগৃহীত রাজস্ব থেকে সম্পদের যে মেঘ তৈরি হবে তার বৃষ্টি হবে সর্বজনের কাছ থেকে দূরে সুবিধাভোগী কিছু মানুষের আঙিনায়, সর্বজন যেখানে পরিত্যক্ত। আইএমএফের তথ্য মতে, বাংলাদেশ ২০১৬ সালের দ্বিতীয় দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতি, যার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৭.১ শতাংশ। আইএমএফের মতে, ২০০৪ সালের পর থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতি গড়ে ৬.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সম্ভব হয়েছে প্রধানত তৈরি পোশাক শিল্পের রপ্তানি আয়, প্রবাসী শ্রমিকদের কষ্টের রেমিট্যান্স এবং স্থানীয় কৃষকদের জন্য। এই যে বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি যারা অর্থাৎ কৃষক, তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিক, সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ, তারাই আবার রাজস্ব দিচ্ছে দেশ পরিচালনার জন্য এবং সেই রাজস্বের ওপর ভিত্তি করে দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য সরকারের বাজেট দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই মানুষগুলো দেশ টিকিয়ে রেখেছে, অথচ বিনিময়ে তারা শুধু শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। বাজেট নিয়ে তাদের কোনো প্রত্যাশাই নেই। কারণ বাজেটের ধূম্রজাল তারা বোঝে না। সরকারের দায়িত্ব ছিল তাদের কল্যাণে তাদের অধিকার সুনিশ্চিত করা, সেবার মাধ্যমে তাদের প্রাপ্য ফিরিয়ে দেয়া। কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে তার উল্টো।

এ বছর বাজেটের আকার ৪ লাখ ২৬৬ কোটি টাকা, অর্থাৎ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সরকারের হাত দিয়ে মোট এই ৪ লাখ ২৬৬ কোটি টাকা খরচ হবে। পক্ষান্তরে মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২ লাখ ৮৭ হাজার ৯৯০ কোটি টাকা। এই রাজস্ব আয়ের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) আয় ধরা হয়েছে ২ লাখ ৪৮ হাজার ১৯০ কোটি টাকা, অর্থাৎ জনগণের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ কর, যেমন–আয়কর ও কর্পোরেট কর এবং পরোক্ষ কর, যেমন–ভ্যাট, আবগারি শুল্ক, আমদানি শুল্ক ও রপ্তানি শুল্কের মাধ্যমে এই ২ লাখ ৪৮ হাজার ১৯০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হবে, যা মোট বাজেটের ৬২ শতাংশ। এই ২ লাখ ৪৮ হাজার ১৯০ কোটি টাকার ৩৬.৮ শতাংশ আসবে ভ্যাট থেকে, ৩৪.৩ শতাংশ আসবে আয়কর থেকে, ১২.১ শতাংশ আসবে আমদানি শুল্ক থেকে, ১৫.৫ শতাংশ আসবে সম্পূরক শুল্ক থেকে এবং ১.৩ শতাংশ আসবে অন্যান্য থেকে। আর এনবিআর-বহির্ভূত খাত (যেমন–যানবাহন থেকে প্রাপ্ত আয়, ভূমি থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব, স্ট্যাম্প থেকে আয় প্রভৃতি) থেকে রাজস্ব আয় ধরা হয়েছে ৮ হাজার ৬২২ কোটি টাকা, যা বাজেটের ২.১ শতাংশ, এবং কর ব্যতীত রাজস্ব আয় ধরা হয়েছে ৩১ হাজার ১৭৯ কোটি টাকা, যা বাজেটের ৭.৮ শতাংশ। বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ ১ লাখ ১২ হাজার ২৭৬ কোটি টাকা এবং এই ঘাটতি পূরণের উৎস দুটি–

(১) বৈদেশিক উৎস থেকে জোগান দেয়া হবে ৫১ হাজার ৯২৪ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ১৩ শতাংশ (যেখানে–বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ থাকবে ১.৪ শতাংশ এবং বৈদেশিক ঋণ ১১.৬ শতাংশ) এবং

(২) অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ হিসেবে জোগান দেয়া হবে ৬০ হাজার ৩৫২ কোটি টাকা, যা বাজেটের ১৫.১ শতাংশ।

অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে নেয়া হবে ২৮ হাজার ২০৩ কোটি টাকা এবং সঞ্চয়পত্র বিক্রি ও অন্যান্য ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে ৩২ হাজার ১৪৯ কোটি টাকা।

এ বছর মোট বাজেটের মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ২ লাখ ৩৪ হাজার ১৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধে ব্যয় হবে ৫৩ হাজার ৮৩৩ কোটি টাকা। আর উন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ১ লাখ ৫৯ হাজার ১৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) রয়েছে ১ লাখ ৫৩ হাজার ৩৩৩ কোটি টাকা।

এখন আসা যাক মেগা বাজেট নিয়ে মেগা সংশয়ের জায়গায়। কয়েকটি বিষয় পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায় এই মেগা বাজেটের দুর্বলতা।

বিগত বছরগুলোর মতো এ বাজেটেও সর্বজনের কাছ থেকে সংগৃহীত রাজস্ব থেকে সম্পদের যে মেঘ তৈরি হবে তার বৃষ্টি হবে সর্বজনের কাছ থেকে দূরে সুবিধাভোগী কিছু মানুষের আঙিনায়

আসলেই কি মেগা বাজেট

কয়েক বছর ধরে প্রতিবারই বাজেট ঘোষণার পর থেকেই এর আকৃতি নিয়ে আলোচনার ঝড় ওঠে। অর্থমন্ত্রী বাজেট ঘোষণা করে সেটাকে উচ্চাভিলাষী বা মেগা বাজেট বলে তৃপ্তির ঢেকুর তোলেন আর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে তার রেশ। কিন্তু আসলেই কি বাংলাদেশের বাজেট মেগা বাজেট? ছক-১ থেকে জিডিপির ক্রম অনুসারে বাংলাদেশের আশপাশে থাকা কিছু দেশের জিডিপি এবং ২০১৬ সালের তাদের বাজেটের উপাত্ত দেখা যাক।

বিশ্বব্যাংকের উপাত্ত থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশ ৪৪তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ, যার জিডিপির পরিমাণ ২২১.৪১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সিআইএর উপাত্ত থেকে দেখা যায়, ২০১৬ সালে সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৩৫.৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এখন বাংলাদেশের ঠিক ওপরের দেশটি অর্থাৎ ৪৩তম অর্থনীতির দেশ ফিনল্যান্ডের দিকে তাকালে দেখতে পাই, তাদের জিডিপি বাংলাদেশের চেয়ে ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বেশি, অথচ তাদের বাজেট বাংলাদেশের চেয়ে প্রায় ৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বেশি। বাংলাদেশের ঠিক পরের অর্থনীতি হলো পর্তুগাল অথচ তার বাজেট বাংলাদেশের প্রায় ৩ গুণ। গ্রিসের জিডিপি

ছক-১: বিভিন্ন দেশে জিডিপি ও বাজেট আকৃতি

দেশের নাম	জিডিপির ক্রম	জিডিপির পরিমাণ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	বাজেটের পরিমাণ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)
মালয়েশিয়া	৩৭	২৯৬.৩৫৯	৬৩.০১
দক্ষিণ আফ্রিকা	৩৮	২৯৪.৮৪১	৮৬.৪৫
আয়ারল্যান্ড	৩৯	২৯৪.০৫৪	৮০.৮৬
পাকিস্তান	৪০	২৮৩.৬৬	৫৪.৬৩
কলম্বিয়া	৪১	২৮২.৪৬৩	৮৮
চিলি	৪২	২৪৭.০২৮	৫৫.৭৪
ফিনল্যান্ড	৪৩	২৩৬.৭৪৮	১৩২.৭
বাংলাদেশ	৪৪	২২১.৪১৫	৩৫.৩২
পর্তুগাল	৪৫	২০৪.৫৬৫	৯২.২৫
ভিয়েতনাম	৪৬	২০২.৬১৬	৫৭.২১
গ্রিস	৪৭	১৯৪.৫৫৯	১০২.১
পেরু	৪৯	১৯২.০৯৪	৬৬.৪৫
রোমানিয়া	৫০	১৮৬.৬৯১	৬২.১৪
নিউজিল্যান্ড	৫১	১৮৫.০১৭	৬৭.০১
ইরাক	৫২	১৭১.৪৮৯	৭৭.৮৭
আলজেরিয়া	৫৩	১৫৬.০৮	৬৬.৪৫
হাঙ্গেরি	৫৪	১২৪.৩৪৩	৬০.০৮
কাজাখস্তান	৫৫	১৩৩.৬৫৭	২৭.২৫
কাতার	৫৬	১৫২.৪৬৯	৫৩.৯৫
কুয়েত	৫৭	১১৪.০৪১	৬৫.৩২
মরক্কো	৫৮	১০১.৪৪৫	২৯.৪৩
ইকুয়েডর	৫৯	৯৭.৮০২	৩৪.৯
ইউক্রেন	৬১	৯৩.২৭	৩০.২৭
অ্যাঙ্গোলা	৬২	৮৯.৬৩৩	৩৩.৫

(উৎস : world development indicators database, World Bank, 17 April 2017 এবং cia world factbook: budget)

বাংলাদেশের চেয়ে প্রায় ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার কম, অথচ তাদের বাজেটও বাংলাদেশের ৩ গুণ। ৫২তম অর্থনীতির দেশ ইরাক, যার জিডিপি বাংলাদেশের চেয়ে ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার কম, অথচ বাজেট বাংলাদেশের দ্বিগুণ। জিডিপির হিসাবে কিউবা বাংলাদেশের তিন ভাগের এক ভাগের একটু বেশি, অথচ কিউবার বাজেট বাংলাদেশের দেড় গুণের বেশি। কুয়েতের জিডিপি বাংলাদেশের অর্ধেক, অথচ তাদের বাজেট বাংলাদেশের দ্বিগুণ। জিডিপির ক্রম অনুসারে বাংলাদেশের নিচে অবস্থানকারী ১২টি দেশের মধ্যে একমাত্র কাজাখস্তান ছাড়া বাকি ১১টি দেশের বাজেটই বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং জিডিপি ও বাংলাদেশের আশপাশের দেশগুলোর উপাত্ত দেখলেই এটা স্পষ্ট হয়, আসলে যত বড় করে দেখা হয়, বাংলাদেশের বাজেট এত বড় নয়।

মেগা সংশয়

কিন্তু বাংলাদেশের বাজেট বাস্তবায়ন নিয়ে যে সংশয় তা অত্যন্ত বড়। বিগত কয়েক বছরের বাংলাদেশের বাজেট ও তার বাস্তবায়নের হার দেখলেই তা সুস্পষ্ট হয়। ছক-২ এর উপাত্ত দেখলেই বোঝা যায় সংশয়ের তীব্রতা। যেখানে ২০১০-১১ অর্থবছরে বাজেট বাস্তবায়নের হার

ছক-২ : বিগত কয়েক বছরের বাজেট বাস্তবায়নের হার

অর্থবছর	মূল বাজেট (কোটি টাকা)	সংশোধিত বাজেট (কোটি টাকা)	বাস্তবায়িত বাজেট (কোটি টাকা)	বাস্তবায়নের হার (শতাংশ)
২০১০-১১	১,৩২,১৭০	১,৩০,০১১	১,২৮,২৮৬	৯৭.০৬
২০১১-১২	১,৬৩,৫৮৯	১,৬১,২১৩	১,৫২,৪২৮	৯৩.১৮
২০১২-১৩	১,৯১,৭৩৮	১,৮৯,৩২৬	১,৭৪,০১৩	৯০.৭৬
২০১৩-১৪	২,২২,৪৯১,	২,১৬,২২২	১,৮৮,২২৩	৮৪.৫৯
২০১৪-১৫	২,৫০,৫০৬	২,৩৯,৬৬৮	২,০৪,৩৮০	৮১.৫৯
২০১৫-১৬	২,৯৫,১০০	২,৬৪,৫৬৫	২,৩১,৬৫৩	৭৮.৫

(উৎস : অর্থ মন্ত্রণালয়)

ছিল ৯৭.০৬ শতাংশ, ২০১১-১২ অর্থবছরে তা কমে হয় ৯৩.১৮, ২০১২-১৩ অর্থবছরে হয় ৯০.৭৬, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে হয় ৮৪.৫৯, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে হয় ৮১.৫৯ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে হয় ৭৮.৫০ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতিবছর আকৃতির দিক থেকে ব্যাপক পরিমাণে বাড়ছে বাজেট এবং বাস্তবায়নের দিক থেকে তা ব্যাপক হারে কমছে। তাই চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪ লাখ ২৬৬ কোটি টাকার মেগা বাজেটের অবস্থাও যে অভিন্ন হবে তা বলাই যায়। এর মধ্যে ২ লাখ ৮৭ হাজার ৯৯১ কোটি টাকার মোট রাজস্ব আয়ের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে তার মধ্যে ভ্যাটের মাধ্যমে আদায় করা হবে ৯১ হাজার ২৫৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আয়ের লক্ষ্য ছিল নতুন ভ্যাট আইন কার্যকর করার মাধ্যমে। সেটা দুই বছরের জন্য স্থগিত হয়েছে, অথচ বাজেটের পরিমাণ সংশোধন না করেই তা পাস হয়েছে। সুতরাং এই মেগা বাজেটের বাস্তবায়ন আরো দুরূহ হয়ে পড়ল, কারণ এই বাজেট বাস্তবায়ন করতে হলে এনবিআরকে আগের তুলনায় ৩৩ শতাংশ বেশি ভ্যাট আদায় করতে হবে, যা ভ্যাটের বর্তমানে প্রচলিত আইনে সংগ্রহ করা অসম্ভব বলা চলে। উল্লেখ্য, ২০ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি কখনোই অর্জন করতে পারেনি এনবিআর।

নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের বাজেটের একটা বড় দুর্বল দিক হলো এডিপি বাস্তবায়ন নিয়ে লুকোচুরি। কোনো বছরই এডিপির বাস্তবায়ন পুরোপুরি হয় না। বিগত কয়েক বছরের উপাত্ত দেখলে দেখা যায়, সর্বোচ্চ ৯৩ শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছিল ২০১৩-১৪ অর্থবছরে, কিন্তু গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এডিপির বাস্তবায়ন ছিলো ৮ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

এডিপি বাস্তবায়িত না হওয়াটা যতটা না দক্ষতার অভাবে, তার চেয়েও বেশি হয়তো দুর্নীতির কারণে। প্রতিবছরই দেখা যায়, বাজেট কার্যকর হবার পর প্রথম ৬ মাসে মাত্র ২০ শতাংশের মতো কাজ হয়, প্রথম ১০ মাসে ৬০ শতাংশের মতো কাজ হয় আর শেষের ২ মাসে তাড়াহুড়া করে বাকি কাজ করা হয়। যেমন ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রথম

ছক-৩ : বিগত কয়েক বছরে প্রথম ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) এডিপির বাস্তবায়ন

অর্থবছর	প্রথম ১০ মাসে এডিপির বাস্তবায়ন (শতাংশ)
২০১২-১৩	৫৪
২০১৩-১৪	৫৪
২০১৪-১৫	৫৬
২০১৫-১৬	৫০
২০১৬-১৭	৫২

সূত্র: প্রথম আলো

১০ মাসে এডিপি বাস্তবায়িত হয়েছিল মাত্র ৫০ শতাংশ এবং প্রথম ১১ মাসে বাস্তবায়িত হয়েছিল মাত্র ৬৪.৭২ শতাংশ। তার আগের অর্থবছর অর্থাৎ ২০১৫-১৬ তেও প্রথম ১১ মাসে বাস্তবায়িত হয়েছিল মাত্র ৬২ শতাংশ। অর্থাৎ প্রথম ১০ মাসে কাজ ঝিমিয়ে থাকে আর শেষের দুই মাসে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করার নামে চলে ব্যাপক দুর্নীতি। হয়তো এ বছরও তার ব্যতিক্রম হবে না। আর ২০১৭-১৮ অর্থবছরেও এডিপিতে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ রাখা হয়েছে অবকাঠামো খাতে। পৃথিবীর মধ্যে প্রতি কিলোমিটার সড়কপথ এবং ব্রিজ বা সেতু তৈরিতে সবচেয়ে বেশি খরচ হয় বাংলাদেশে। ব্যাপারটা এই না যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে গুণগত মানসম্পন্ন সড়কপথ ও ব্রিজ তৈরি হয় বাংলাদেশে। সুতরাং বোঝাই যায়, সড়কপথ ও ব্রিজ নির্মাণে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয় বাংলাদেশে। হয়তো এ কারণেই এডিপিতেও এই খাতে বরাদ্দও রাখা হয় সবচেয়ে বেশি।

> প্রতিবছরই দেখা যায়, বাজেট কার্যকর হবার পর প্রথম ৬ মাসে মাত্র ২০ শতাংশের মতো কাজ হয়, প্রথম ১০ মাসে ৬০ শতাংশের মতো কাজ হয় আর শেষের ২ মাসে তাড়াহুড়া করে বাকি কাজ করা হয়। যেমন–২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রথম ১০ মাসে এডিপি বাস্তবায়িত হয়েছিল মাত্র ৫০ শতাংশ এবং প্রথম ১১ মাসে বাস্তবায়িত হয়েছিল মাত্র ৬৪.৭২ শতাংশ।

২০১৭-১৮ সালের বাজেটে ঘাটতি পূরণের জন্য বৈদেশিক উৎস থেকে জোগান দেয়া হবে ৫১ হাজার ৯২৪ কোটি টাকা। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির মতে, অর্থায়নের সব উৎস দেখার পরে ব্যয়ের হিসাব যখন মিলছে না, তখন পুরোটাই বৈদেশিক সাহায্য থেকে আসবে ধরে নিয়ে যোগ করা হয়েছে। কারণ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ২৭০ কোটি ডলার সাহায্য এসেছিল, সেখানে একলাফে ৭৬০ কোটি ডলারের প্রাক্কলন অনেকটা আকাশ-কুসুম স্বপ্নের মতো। তা ছাড়া বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ায় কিছুটা কঠিনও হবে বৈদেশিক ঋণ প্রাপ্তি। বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে এখন আগের চেয়ে বেশি সুদ গুনতে হবে এবং কমে যাবে ঋণ পরিশোধের সময়সীমা।

প্রতিবছরের মতো এবারও বেড়েছে সামরিক খাতে ব্যয়। এ বছর সামরিক খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২৫ হাজার ৭৫৬ কোটি টাকা। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এই খাতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছিল ১৩ হাজার ৯২০ কোটি টাকা। অর্থাৎ গত ৪ বছরে এই খাতে বরাদ্দ দ্বিগুণ হয়েছে। একই সাথে জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২২ হাজার ৮৫১ কোটি টাকা। সরকার জনমানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারলেও এই ব্যয়বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিকই। পাশাপাশি তুলনামূলকভাবে কমেছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগে ১৭,৪৮৬ কোটি থেকে ১৬,১৮২ কোটি টাকা হয়েছে। কৃষি খাতেও বরাদ্দ কমেছে।

এ বছর বাজেটে কমেছে বন ও পরিবেশ বিভাগের বরাদ্দও। ২০১৫-১৬ সালে যেখানে এই খাতে প্রকৃত ব্যয় ছিল ১ হাজার ১২০ কোটি টাকা এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১ হাজার ৮৫০ কোটি টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তা কমিয়ে করা হয়েছে মাত্র ৯০৮ কোটি টাকা। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি পরিবেশ বিপর্যয়ে পড়বে যেসব দেশ বাংলাদেশ তাদের মধ্যে প্রথম দিকে। পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য সরকার বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার কাছে সাহায্যের জন্য যাচ্ছে, অথচ পরিবেশ বিপর্যয় রোধে সরকারের তেমন কোনো পরিকল্পনাই নেই। বরং সরকার বন ও পরিবেশ বিভাগে বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে এবং একই সাথে পরিবেশ বিপর্যয় ত্বরান্বিত করার জন্য জোরপূর্বক সুন্দরবনবিনাশী রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করতে চাচ্ছে এবং সে জন্য এই বাজেটে কয়লা আমদানিতে শুল্ক শূন্য করা হয়েছে। অন্যদিকে সোলার প্যানেল আমদানির ওপর বসানো হয়েছে শুল্ক। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ উন্নত দেশগুলো যেখানে একে একে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করে দিচ্ছে, সেখানে সরকার সুন্দরবন ধ্বংস করে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করতে চাচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে বেশি সংশয়ের বিষয় হলো খেলাপি ঋণ ও অর্থপাচার। আমাদের দেশে গ্রামের একজন সাধারণ মানুষ ৫ হাজার টাকা ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে দিতে ব্যর্থ হলে তাদের ঘরের চাল বা গবাদি পশু নিয়ে নেয়া হয় বা তা না থাকলে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় অথচ ৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ খেলাপিরা সরকারের সাথেই বীরবেশে ঘুরে বেড়ায় এবং তাদের খেলাপি ঋণ আদায়ে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় না। তদুপরি সাধারণ মানুষের আমানতের টাকা সরকারি ব্যাংকগুলো থেকে নিয়ে সরকারি ব্যাংকগুলোকে মুমূর্ষু করে রেখেছে এবং এই বাজেটেও সরকার সরকারি ব্যাংকগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে। বিগত কয়েক বছরে সরকার ব্যাংকগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ১২ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে, যা সাধারণ মানুষের কাছ থেকেই রাজস্ব আকারে সংগৃহীত। গত ১০ জুলাই সংসদে প্রদত্ত সরকারি বিবরণীতেই জানানো হয়েছে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১ লাখ ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি। বৃহৎ ঋণখেলাপিদের তালিকা ব্যাংকগুলো এবং সরকার উভয়ের কাছেই আছে, অথচ তাদের কাছ থেকে খেলাপি ঋণ আদায় না করে বা তাদের শাস্তির আওতায় না এনে ব্যাংকগুলোকে অর্থ জোগান দিয়ে সরকার ঋণখেলাপিকে আরো উৎসাহিত করছে।

অন্যদিকে অর্থপাচার বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য ক্যান্সারের আকার ধারণ করছে। দুর্নীতি ও কালো টাকার একটা বড় অংশই এখন পাচার হয়ে যাচ্ছে। প্রবাসী শ্রমিকদের প্রেরিত কষ্টের ডলার দেশের কাজে না লেগে পাচার হয়ে যাচ্ছে, অথচ সরকার তা বন্ধের জন্য তেমন পদক্ষেপই নিচ্ছে না। অর্থপাচার রোধে সরকারের সুনির্দিষ্ট কোনো পদক্ষেপই নেই। ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফিন্যানশিয়াল ইন্টিগ্রিটির (জিএফআই) প্রাক্কলন অনুযায়ী, ২০১৪ সালে বাংলাদেশ থেকে অর্থপাচারের পরিমাণ ১ হাজার কোটি ডলার ছাড়িয়েছে। পোশাকশিল্পের বাইরে অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের সম্মিলিত যে আয়, তার চেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ প্রতিবছর অবৈধভাবে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। শুধুমাত্র

সুইস ব্যাংকগুলোতে ২০১৬ সালে বাংলাদেশ থেকে জমা হওয়া অর্থের পরিমাণ প্রায় ৫ হাজার ৬৮৫ কোটি টাকা এবং ২০১৫ সালে সুইস ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশ থেকে জমা হওয়া অর্থের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪ হাজার ৭৩০ কোটি টাকা (প্রথম আলো, ৩০ জুন ২০১৭)।

শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ও বাস্তবতা

বাংলাদেশ এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে এবং দ্রুত মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবার স্বপ্নে বিভোর। তার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ হলো শিক্ষা ও গবেষণায় বাজেটের একটা বড় অংশ বরাদ্দ। বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পরিমাণ হলো জিডিপির ৬ শতাংশ কিংবা বাজেটের ২০ শতাংশ। অথচ বাংলাদেশে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে যে বরাদ্দ দেয়া হয় সেটা জিডিপির মাত্র ২ শতাংশ। ২০০১ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত শিক্ষা খাতে সরকারের ব্যয়ের বিশ্বব্যাংকের উপাত্ত দেখা যাক।

২০০১ সালে শিক্ষা খাতে সরকারের ব্যয় ছিল জিডিপির মাত্র ২.১৬৮ শতাংশ, যা পরবর্তী বছরগুলোতে কখনো কমেছে বা সামান্য

ছক-৪ : শিক্ষা খাতে সরকারের ব্যয়, জিডিপির শতকরা অংশ

বছর	জিডিপির শতকরা অংশ
২০০১	২.১৬৮
২০০২	২.০১৯
২০০৩	২.০৭১
২০০৪	১.৯৪২
২০০৬	২.১৩২
২০০৭	২.২০৪
২০০৯	১.৯৩৮
২০১১	২.১৩১
২০১২	২.১৭৫
২০১৩	১.৯৭৫
২০১৬	১.৯২৬

(উৎস : Government expenditure on education,total percentage of GDP, world development indicator)

বেড়েছে। শিক্ষা খাতে সরকারের সর্বোচ্চ ব্যয় ছিল ২০০৭ সালে, যা জিডিপির মাত্র ২.২০৪ শতাংশ। ২০১৬ সালে তা কমে ১.৯২৬ শতাংশে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষা খাতে সরকারের ব্যয় ২ শতাংশেই ঘুরপাক খাচ্ছে গত ১৬ বছর ধরে এবং তাকে ৬ শতাংশে উন্নীত করার কোনো পরিকল্পনাও সরকারের কাছ থেকে দেখা যাচ্ছে না। হতাশার বিষয় হলো, পৃথিবীর মধ্যে শিক্ষা খাতে বাজেটের বরাদ্দের জন্য সবচেয়ে নিচের সারির দেশগুলোর একটি হলো বাংলাদেশ। বিভিন্ন দেশের শিক্ষা খাতে জিডিপির কত অংশ বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে, সে তথ্যগুলো নিয়ে তুলনা করলে দেখা যায়, ১৬১টি দেশের মধ্যে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের দিক থেকে বাংলাদেশ ১৫৫'তম (State of Bangladesh Economy in FY 2015-16 (third reading), CPD, page 19, 25 May 2016)।

অথচ সরকার খুব ফলাও করে প্রচার করছে যে, ২০১৭-১৮ সালের বাজেটেও একক খাত হিসেবে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ সর্বোচ্চ, যার পরিমাণ ৬৫ হাজার ৪৪৪ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ১৬.৪ শতাংশ। কিন্তু বাস্তবে এখানে রয়েছে একটি শুভংকরের ফাঁকি। শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ করে দেখানোর জন্য এর সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে প্রযুক্তি খাত। আমরা যদি শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতকে একত্রে বিবেচনা করি তাহলে দেখতে পারব যে আসলেই এ খাতে বরাদ্দ বেড়েছে।

দেখা যাক শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দকৃত ৬৫ হাজার ৪৪৪ কোটি টাকা কোন কোন বিভাগে খরচ হবে।

ছক-৫ : শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের বরাদ্দ

বিভাগ	বরাদ্দ (কোটি টাকা)
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ	২২,০২২
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	২৩,১৪০
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ	১১,০৩৮
তথ্য এবং যোগাযোগ ও প্রযুক্তি	৩,৯৭৪
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা	৫,২৬৯

(উৎস : অর্থ মন্ত্রণালয়)

অর্থাৎ শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের বরাদ্দ এই পাঁচটি বিভাগে ভাগ হয়ে যাবে। আমরা যদি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগকে বিবেচনায় আনি তাহলে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ৪৫ হাজার ১৬২ কোটি টাকা। হতাশার বিষয় হলো, গত অর্থবছরের তুলনায় এটি বাড়ার বদলে কমেছে। প্রথমেই দেখা যাক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের বরাদ্দ।

ছক-৬ : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের বরাদ্দ

বাজেট	পরিমাণ (কোটি টাকা)
২০১৫-১৬ সালের প্রকৃত বাজেট	১৬,২৪৪
২০১৬-১৭ সালের প্রস্তাবিত বাজেট	২২,১৬২
২০১৬-১৭ সালের সংশোধিত বাজেট	১৭,৭৯৮
২০১৭-১৮ সালের প্রস্তাবিত বাজেট	২২,০২২

(উৎস : অর্থ মন্ত্রণালয়)

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় দুটি–

(১) ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সরকার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগে ২২ হাজার ১৬২ কোটি টাকা খরচ করার কথা বললেও সংশোধিত বাজেটে তা কমিয়ে মাত্র ১৭ হাজার ৭৯৮ কোটি টাকায় নিয়ে আসা হয়, অর্থাৎ প্রথমে যা খরচ করবে বলেছিল তা করেনি।

(২) ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে যেখানে এই বিভাগে বরাদ্দ ছিল ২২ হাজার ১৬২ কোটি টাকা তা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কমিয়ে করা হয়েছে ২২ হাজার ২২ কোটি টাকা, অর্থাৎ এই মেগা বাজেটে যেখানে মেগা খরচ করার পরিকল্পনা কষা হয়েছে, সেখানে প্রথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগে বরাদ্দ না বাড়িয়ে গত অর্থবছরের চেয়েও কম বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

এখন দেখা যাক মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের বরাদ্দের নমুনা।

ছক-৭ : মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের বরাদ্দ

বাজেট	পরিমাণ (কোটি টাকা)
২০১৫-১৬ সালের প্রকৃত বাজেট	২১,৫৯০
২০১৬-১৭ সালের প্রস্তাবিত বাজেট	২৬,৮৪৮
২০১৬-১৭ সালের সংশোধিত বাজেট	২১,৭০৭
২০১৭-১৮ সালের প্রস্তাবিত বাজেট	২৩,১৪১

(উৎস : অর্থ মন্ত্রণালয়)

এখানেও দেখা যাচ্ছে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগে সরকার যত খরচ করবে বলেছিল সংশোধিত বাজেটে তা অনেক কমিয়ে নিয়ে এসেছে এবং একই সাথে গত অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের বরাদ্দের চেয়ে এই অর্থবছরের বরাদ্দ ৩ হাজার ৭০০ কোটি টাকা কম।

সুতরাং এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে সরকার শিক্ষা খাতে যত খরচ করবে বলে কথা দেয় আসলে তার চেয়ে অনেক কম খরচ করে। পাশাপাশি সামরিক খাতে দেখতে পাই, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে যেখানে ২২ হাজার ১০০ কোটি টাকা খরচ কথা ছিল সংশোধিত বাজেটে তা বাড়িয়ে ২৩ হাজার ২১২ কোটি টাকা করা হয়।

এখন শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের বরাদ্দের দিকে লক্ষ করা যাক।

ছক-৮ : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের বরাদ্দ

বাজেট	পরিমাণ (কোটি টাকা)	অনুন্নয়ন খাত (কোটি টাকা)	উন্নয়ন খাত (কোটি টাকা)
২০১৫-১৬ সালের প্রকৃত বাজেট	১,১৩৭	৩৪৭	৭৯০
২০১৬-১৭ সালের প্রস্তাবিত বাজেট	২,০৬৯	৩৭২	১,৬৯৭
২০১৬-১৭ সালের সংশোধিত বাজেট	৪,২১৩	৩৯৬	৩,৮১৭
২০১৭-১৮ সালের প্রস্তাবিত বাজেট	১১,০৩৮	৪৩৬	১০,৬০২

(উৎস : অর্থ মন্ত্রণালয়)

গত অর্থবছরের তুলনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগে বরাদ্দ ৫ গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর কারণেই বেড়েছে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের বরাদ্দ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগে অনুন্নয়ন খাতের বরাদ্দ তেমন বাড়েনি তবে উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-১৭ সালের বাজেটে এই বিভাগে উন্নয়ন খাতের বরাদ্দ ১ হাজার ৬৯৭ কোটি টাকা থাকলেও সংশোধিত বাজেটে তা বাড়িয়ে করা হয় ৩ হাজার ৮১৭ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এই বিভাগে উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১০ হাজার ৬০২ কোটি টাকা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের উন্নয়ন খাতের এই ব্যাপক বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে দেশকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য নয়, কারণ এই টাকা দিয়ে বড় বড় বিজ্ঞান গবেষণাগার তৈরি হবে না, গবেষণায় বড় ধরনের পরিবর্তনও আসবে না। এর মূলে রয়েছে পাবনার বিতর্কিত রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দ। মূলত এই বিভাগের উন্নয়ন খাতের যে ব্যাপক বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে তার সিংহভাগই খরচ হবে রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য, যা বিদ্যুৎ বিভাগের মধ্যে না দেখিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের বরাদ্দের একটা বড় অংশ যাচ্ছে এবার কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষায়। ২০১৫-১৬ সালের প্রকৃত বাজেটে এই খাতে কোনো খরচই হয়নি। ২০১৬-১৭ সালের প্রস্তাবিত বাজেটেও এই খাতে কোনো বরাদ্দ রাখা হয়নি, তবে ২০১৬-১৭ সালের সংশোধিত বাজেটে হুট করে এই খাতে ৪ হাজার ৭৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয় এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরেও এই খাতে ৫ হাজার ২৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

শেষ কথা

বাংলাদেশে এখন কর্মক্ষম জনসংখ্যা নির্ভরশীল জনসংখ্যার চেয়ে বেশি। কিন্তু এই সুবিধা খুব বেশিদিন থাকবে না। তাই এই কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করতে ব্যর্থ হলে ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মুখ থুবড়ে পড়বে। বর্তমানে তৈরি পোশাকসহ বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে একজন শ্রমিককে দৈনিক গড়ে ১২ ঘণ্টা কাজ করতে হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে আসা-যাওয়া বাবদ নষ্ট হচ্ছে আরো ২ ঘণ্টার মতো সময়। আর এই সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সিংহভাগ শ্রমিকই নারী। সুতরাং তাদেরকে পারিবারিক কাজেও শ্রম দিতে হচ্ছে। যার ফলে একজন শ্রমিকের পক্ষে ৪-৫ ঘণ্টার বেশি বিশ্রাম নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তার ওপর তারা পাচ্ছে না পর্যাপ্ত কিলোক্যালরি। যার ফলে ধীরে ধীরে নষ্ট হচ্ছে স্বাস্থ্যসম্পদ। বিশেষজ্ঞদের মতে, এভাবে টানা ১০ বছর যেসব শ্রমিক কাজ করবে তাদের গড় আয়ু ১০ বছর কমে যাবে। আবার দেখা যাচ্ছে, এইভাবে শ্রম নির্যাতনের শিকার নারী শ্রমিকরা ৪০ বছরের পর কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে অথবা কাজে অক্ষম হয়ে পড়ছে। যেসব প্রবাসী শ্রমিক রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছে তাদেরও শ্রম নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। এর ফল হলো ভবিষ্যতে বাংলাদেশে নির্ভরশীল জনসংখ্যা অনেক বেশি বেড়ে যাবে।

বাংলাদেশ তার কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ না করে অদক্ষ শ্রমিক করে রাখছে। অথচ যদি শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বড় ধরনের বিনিয়োগ করে একটা দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা যায় এবং যদি শ্রম পরিবেশ উন্নত করা যায় তাহলে একটি নির্দিষ্ট বয়সসীমা পার হয়ে গেলেও তারা নির্ভরশীল হয়ে পড়বে না। তাদের মেধা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে পারবে।

অন্যদিকে লেবার ফোর্স সার্ভে ২০১৫-১৬ অনুযায়ী বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারের হার সবচাইতে বেশি। সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াচ্ছে কিন্তু তার গুণগত মান বিকাশে কোনো উদ্যোগ নেই। শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রেই সরকারের টাকা থাকে না। সর্বজনের টাকায় সরকার চলে। যেসব সাধারণ মানুষের টাকার পাহাড় নিয়ে অর্থমন্ত্রী বাজেট দেন, বাজেটে সেবার মাধ্যমে তাদের ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করতে যে সরকার দায়বদ্ধ সেটা অর্থমন্ত্রীর মনে রাখা উচিত।

ইসতিয়াক রায়হান: শিক্ষার্থী, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ইমেইল: istihakshuvo@gmail.com